International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-VII, August 2015, Page No. 22-30
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও সমবায় সমিতি

সুরজিৎ বাগ
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ইউ.জি.সি, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Art is the creation of human being. Folk art is one of the richest cultural parts of our society. Major part of our population inhabit in rural region. Rural people are creators of our traditional folk arts and crafts. Different artisan communities are active bearer of our traditional knowledge of folk art and craft. Through the co-operative society, West Bengal Govt. is giving the opportunity of empowerment to the artisan community. All over the West Bengal, there are different kinds of folk art and craft forms like pottery, weaving, stone carving, mat making etc. which are developing through the co-operative society. Here we have noticed some plus points about the present and future condition of the artisan. Some limitations are hampering the development of co-operative society. The role of co-operative is immensely significant in the development of the folk artisan as well as in continuation of folk art and craft forms. We hope in future, through the co-operative society folk art and craft will be spread out not only in India but also in international market, as well as artisan community will be empowered.
Our interest is to find out role of co-operative society for the overall development of the folk art and crafts genres and artisan communities in West Bengal.

Key Words: Folk art & craft, Artisan, Traditional, Co-operative Society, Community, Empowerment.

১. ভূমিকা : মানুষের সৃজনশীল ও মননশীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হল শিল্প। কোন সৃজনশীল কর্ম যখন ব্যক্তির উর্দ্ধে উঠে গোষ্ঠী বা সমাজের স্বীকৃতি পায় তখন তাকে শিল্পকর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। লোকায়ত বা লৌকিক সমাজে লোকশিল্প এক বিশেষে ঐতিহ্য বহন করে চলে। ঐতিহ্য নির্ভর এই লোকশিল্পের ধারা খুবই মসৃণভাবে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে তা কিন্তু নয়। অনেকক্ষেত্রে ঐতিহ্য প্রবাহের গতিপথ ওঠা-নামা করেছে নানান কারণে। কিছু কিছু শিল্প আঙ্গিক বর্তমানে গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেইসব শিল্প আঙ্গিক সংশ্লিষ্ট শিল্পীরাও পড়েছে সংকটে। জীবিকা নির্বাহের পথ হয়েছে বন্ধুর। ফলে অনেক লোকশিল্পী বিকল্প পথ হিসাবে নিজেদের বৃত্তি বা পেশা ও শিল্পীর ঐতিহ্য বাঁচাতে গড়ে তুলেছে Co-operative বা সমবায় সমিতি। সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও আদিবাসী মানুষ খুঁজে পেয়েছে বাঁচার দিশা। আর এই সূত্রেই শিল্প আঙ্গিকগুলি রক্ষা পেয়েছে অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তির হাত থেকে। অনেকক্ষেত্রে আবার দক্ষতা ও সচেতনতার অভাবে স্বনির্ভরতার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। এই বিফলতার কথা স্মরণে রেখে আমাদের স্বীকার করতেই হবে পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও লোকশিল্পীসমাজে সমবায় সমিতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় গড়ে ওঠা লোকশিল্পীদের সমবায় সমিতিগুলি সংশ্লিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর ও আর্থিকভাবে সচ্ছল করেছে। সুগম হয়েছে আয়ের পথ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতেই হয় শিল্পীগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতি তাদের নানান সুযোগ

ও সুবিধা প্রদান করলেও কোথাও কোথাও পেশাদারিত্বের অভাবে ও অন্যান্য কারণে নানা সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। এই সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সরকারী, বেসরকারী ও শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বারা যৌথভাবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। প্রচলিত সমবায় মডেলকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে লোকশিল্পী ও লোকশিল্প সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। পাশাপাশি প্রসারিত করা যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার লোকশিল্প কেন্দ্রগুলিকে। বহু সংখ্যক শিল্পী ও কারিগর শ্রেণির মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি সজীব ও সচল থাকবে বাংলার ঐশ্বর্যময় ও গৌরবময় ঐতিহ্যনির্ভর দেশীয় লোকশিল্পের আঙ্গিকগুলি। এই ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নানা ধরনের শিল্পকলার বিকাশ হয়েছে আবার হারিয়েও গেছে। লোকশিল্প পুনরুজ্জীবনে সমবায় সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে লোকশিল্পের প্রসারে সমবায় সমিতির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ : লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় লোকশিল্প (Folk Art & Craft) হল বস্তুগত লোকসংস্কৃতির (Materialized Folklore) একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। Folk Art বা লোকচারুশিল্প Folk Craft বা লোককারুশিল্প-এই দুটি উপশাখা যা নিয়ে লোকশিল্পের বলয় তৈরি হয়েছে। লোকচারুশিল্প মূলত লোকচিত্রাঙ্কন শৈলী নির্ভর। অন্যদিকে লোককারু শিল্প হল বৃহৎ হাতিয়ারের (Tools) সাহায্যে দেশীয় পদ্ধতিতে (Indigenous Process) সৃষ্ট ব্যবহারিক ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান নান্দনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ঐতিহ্যময় শিল্প আঙ্গিক। যেমন: শঙ্খশিল্প, তাঁতশিল্প, শোলাশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি। আর এই দুই বর্গের শিল্প আঙ্গিকগুলির স্রষ্টা হলেন শিল্পী বা কারিগর। সমষ্টি বিচারে শিল্পীসমাজ, যেমন : শাঁখারী, মালাকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার ইত্যাদি। আদিবাসী গোষ্ঠীও শিল্পীসমাজ হিসাবে বিবেচিত হবে নির্দিষ্ট শিল্প আঙ্গিকের বিচারে। যেমন - বয়নশিল্পের সূত্রে মেচ ও অন্যান্য জনজাতি, সাবুই ঘাসের শিল্পসূত্রে শবর জনজাতি ইত্যাদি। পটুয়া শিল্পীসমাজকেও পৃথকভাবে লোকশিল্পীসমাজ হিসাবে ধরা যায়।

লোকশিল্প শুধুমাত্র শিল্পের জন্য শিল্প নয়— এ শিল্প জীবনের জন্য শিল্প। লোকশিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন মতামত সামনে উঠে আসে। লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকশিল্পের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন যে :

> *"অনভিজাত লোকায়ত সমাজের শাস্ত্রানুযায়ী শিক্ষা নিরপেক্ষ মূলত ঐতিহ্যানুসারী সমষ্টিগত চেতনার প্রথাগত শৈল্পিক অভিব্যক্তিই লোকশিল্প।"* [১]

সামগ্রিকতার বিচারে লোকশিল্প হল :

> *"ঐতিহ্যময় মানবগোষ্ঠীর শিল্পচেতনার বহিঃপ্রকাশ, যা লোকায়ত সমাজের সমষ্টিগত আবেগ-অনুভূতি, ব্যবহারিক প্রয়োজন, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্মচেতনা, নান্দনিকবোধ ইত্যাদি শিল্পরূপ লাভ করে বিভিন্ন আঙ্গিক, শৈলী ও মাধ্যমের অবলম্বনে। লোককারুকলা ও লোকচারুকলা-এই দ্বিবিধ রূপের সম্মিলিত লোকশিল্পের রক্ষণশীলতা রক্ষিত হয় প্রতীকী ব্যঞ্জনা, মোটিফ, সৃজনগত কৃৎকৌশল, অলংকরণশৈলী, বর্ণসমন্বয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে। অন্যদিকে জাতিগত বৃত্তিনির্ভর এই শিল্পকলা সমবেত ও পারিবারিক সর্বোপরি যৌথশিল্প, যা প্রাথানুগত্য ও বংশপরম্পরায় প্রবাহিত এবং লোকায়ত সমাজ ভাবনার প্রতিবিম্ব-যার আবেদন শাশ্বত; তাৎপর্যের নিরিখে লৌকিক প্রাণরসে ভাবৈশ্বর্যময়।"* [২]

পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় লোকশিল্পকলার ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষ এই শিল্পকলার লালন-পালনকারী। জাতিগতবৃত্তি হিসাবে লোকশিল্পের আঙ্গিকগুলি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিকশিত হলেও পরবর্তী সময়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। পৌরাণিক সূত্রানুসারে শিল্পকারদের জনক হলেন বিশ্বকর্মা এবং তাঁর থেকেই সকল শিল্পীর উৎপত্তি। ঘৃতাচীর গর্ভে বিশ্বকর্মার নয়টি পুত্রের জন্ম হয়, ১. মালাকার, ২. কর্মকার, ৩. শঙ্খকার, ৪. তন্তুবায়, ৫. কুম্ভকার, ৬. কাংসকার, ৭. সূত্রধর, ৮. চিত্রকর, ৯. স্বর্ণকার।

লোকশিল্পকে ধারণ করে লোকশিল্পী সমাজ। লোকশিল্পকে কেন্দ্র করে একাধিক লোকশিল্পী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই। যেমন- শঙ্খশিল্প ও শাঁখারি শিল্পীসমাজ, মৃৎশিল্প ও কুম্ভকার শিল্পীসমাজ, তাঁতশিল্প ও তন্তুবায় শিল্পীসমাজ, শোলাশিল্প ও মালাকার শিল্পীসমাজ ইত্যাদি। লোকশিল্পে লোকসমাজের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, ব্যক্তি ডুবে যায় দলে তাই শিল্পীর নাম চিহ্নিত হয় না। শিল্পীর নান্দনিক পরিতৃপ্তি, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রয়োজনে লোকশিল্পের সৃষ্টি ও বিবর্তন ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। কত স্বল্প ও তুচ্ছ উপকরণ- মাটি, কাঠ, পাথর, বাঁশ, বেত, শোলা প্রভৃতি উপাদান দিয়ে কী অসাধারণ শিল্পবস্তু লোকশিল্পীরা প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলেছে।

বর্তমানে লোকশিল্পগুলির অবস্থা খুব ভালো নয়। লোকশিল্পীরা ক্রমশ এই পেশা থেকে সরে আসছে। বাজারে লোকশিল্পের চাহিদা থাকলেও লোকশিল্পীরা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে। শিল্পীরা তার পরবর্তী প্রজন্মকে এই পেশায় নিয়ে আসতে চাইছে না। কাঁচামালের দাম বাড়লেও উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যগুলির দাম সেভাবে বৃদ্ধি পায় নি, ফলে পারিশ্রমিক অন্যান্য পেশার তুলনায় অনেক কম। সৃজনশীলতা এবং শৈল্পিক গুণে এখনও কিছু লোকশিল্পী কোনরকম ভাবে টিকে আছে। লোকশিল্প ও লোকশিল্পী সমাজের এই করুণ অবস্থার জন্য মূলত দুটি কারণ বিশেষভাবে দায়ী, **প্রথমত:** সরকারী উদাসীনতা। সরকার যথার্থভাবে এই লোকশিল্পীদের পাশে কখনো দাঁড়ায়নি। এই ঐতিহ্যময় লোকশিল্প আঙ্গিকগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধারাবাহিক কার্যকারী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। **দ্বিতীয়ত:** অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা। বাজারে লোকশিল্পের চাহিদা থাকলেও শিল্পীরা সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না, মধ্যবর্তী এক শ্রেণির মানুষ লভ্যাংশের বেশির ভাগটাই গ্রাস করছে। সরকার কর্তৃক কাঁচামাল কিংবা উৎপন্ন পণ্যের পাইকারি মূল্য বেধে দেওয়া হয় নি। ফলে নুন্যতম দামে মধ্যবর্তী শ্রেণি পাইকারি হারে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে ক্রেতাদের কাছে অনেক বেশি অর্থের বিনিময়ে তা বিক্রি করছে। ফলে লোকশিল্পীরা উৎসাহ হারাচ্ছেন, মাঝখান থেকে মধ্যবর্তী কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ফুলে ফেঁপে উঠছে।

লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজকে এই করুণ অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবনের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরী। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল:[৩]

১. লোকশিল্পীদের নিয়ে যৌথভাবে সমবায় সমিতি অথবা Cluster গড়ে তুলতে হবে ।
২. সরকারী ও বেসরকারী সহায়তা প্রদান।
৩. লোকশিল্পীদের নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৪. লোকশিল্পের ঐতিহ্য বজায় রেখে যুগোপযোগী শৈলী বা নক্‌শার প্রবর্তন করা।
৫. লোকশিল্পীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক ও জাতীয়স্তরে পুরস্কৃত করা।
৬. লোকশিল্পের কাঁচামাল এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সরকার কতৃক নির্দিষ্ট মূল্য বেধে দেওয়া।
৭. লোকশিল্পের প্রচার, প্রদর্শনী মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীরা সাধারণত বিচ্ছিন্নভাবে লোকশিল্পের আঙ্গিকগুলি সৃজন করে থাকেন। যৌথভাবে সমবায় পদ্ধতিতে ঐক্যমতের ভিত্তিতে যদি শিল্পীদের একত্রিত করা যায় তবে লোকশিল্পীরা নতুন করে বাঁচার পথ খুজে পাবে। একই সঙ্গে লোকশিল্পের বিস্তার ও প্রসার লাভ করবে, উৎপাদক এবং ক্রেতাদের মাঝে মধ্যবর্তী শ্রেণির অবলুপ্তি ঘটবে। ফলে শিল্পীরা সরাসরি সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাঁচামাল ক্রয় করবে এবং উন্নত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে যাবে।

৩. সমবায় সমিতির ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা : Co-operative Society-এর বাংলা পরিভাষা হল সমবায় সমিতি। আভিধানিক অর্থে সমবায় সমিতি হল : ‘পরস্পরের সাহায্যার্থে যৌথভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান’। ‘সমবায়’ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যময়, যার অর্থ সমবেত ও যৌথকর্ম প্রচেষ্টা। সমবায় দর্শনের মূল কথা হল প্রত্যেকে সকলের স্বার্থে নিবেদিত। এই মূল্যবোধের দিকগুলি হল : আত্মসাহায্য, আত্মদায়িত্ব, গণতন্ত্র, সমতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি। কাজেই সমবায় ব্যবস্থাপনার শিকড় জনসাধারণের মধ্যে প্রোথিত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সচেতনতার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সমবায় নীতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের দেশে সমবায় সমিতির প্রাসঙ্গিকতা অত্যান্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সমবায় সমিতির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন :

> *“আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ-প্রণালী আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে।”* [৪]

রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎ বাণী বর্তমানে অনেকাংশেই বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে তিনি কামনা করেছেন এই বলে:

> *“...সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণহোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টার পবিত্র সম্মিলনতীর্থে অন্নপূর্ণার আসন ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক।”* [৫]

আন্তজার্তিক সমবায় মৈত্রী সংঘ বা International Co-operative Alliance রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (UNESCO) একটি প্রথম শ্রেণির সংগঠন। সমবায় ও সমবায় সমিতির প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা বিষয়ে তাদের দেওয়া সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য:

> *"A co-operative is an autonomous association of persons united, voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspiration through a jointly owned and democratically controlled enterprise."*[৬]

অর্থাৎ, সমবায় হল বিভিন্ন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় গঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা সাধারণ আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানো ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য গঠিত হয় এবং যৌথ মালিকানার সূত্রে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশে বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই সমবায় সমিতি বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যে বর্তমানে সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ২৫০০০ এবং তাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় এক কোটি। এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট গৌরবময়।

ভারতে সমবায় আইনের সূচনা হয় ১৯০৪ সালের ২৫শে মার্চ। অবিভক্ত বাংলার সমবায় আন্দোলনের দুই প্রাণপুরুষ হলেন, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমবায় সমিতির গতি সঞ্চারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বাধীনোত্তরকালে বাম আন্দোলনের সুবাদে সমবায় আন্দোলন দৃঢ়তা পায়। সরকারী সহায়তা এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে অনুঘটকের কাজ করেছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমবায় বিভাগ বা Department of Co-operation রয়েছে। কাজেই সরকারী স্তরেও বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আইন প্রসঙ্গে সরকারের সমবায়ের বিভাগের ওয়েবসাইটে উল্লেখিত হয়েছে:

> *"The Bengal province had its own law on co-operatives with enactment of the Bengal co-operative societies Act 1940. The law was once again replaced by passing of the West Bengal co-operative societies Act, 1973 presently the West Bengal co-operative society Act. 1983 and the rules tramed there under effective from 01.08.1987, provides the framework for the co-operative development in the state."*[৭]

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রসারে সমবায় আইন ও সমবায় বিভাগের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকারের সমবায় বিভাগের নীতি বাস্তবায়িত হয় কো-অপারেশন ডাইরেক্টোরেটের তিনটি জোনাল ও বাইশটি রেঞ্জ অফিসের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে ১৭ ধরনের সমবায় রয়েছে। সমবায়ের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে রাজ্য সরকারের সমবায় বিভাগের দুটি শাখা: (১) Co-operation Directorate, (২) Co-operative Audit Directorate। সমবায়ের ধরনগুলি হল: ভোগকারীদের সমবায় (Consumers Co-operative), উৎপাদনকারীদের সমবায় (Producers Co-operative), সমবায় বিপণন সমিতি (Co-operative Marketing Society), আবাসন সমবায় সমিতি (Housing Co-operative Society) সমবায় ঋণদান সমিতি (Co-operative Credit Society) ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে 'সমবায়' শব্দটি আধুনিক হলেও এর বাস্তব প্রয়োগ অতিপ্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'ধর্মগোলা' কিংবা মৌর্যযুগের কারিগরদের গিল্ড ব্যবস্থার মধ্যে সমবায় ভাবনায় যৌথ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। সমবায়ের জনক হলেন রবার্ট আওয়েন। তিনি ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডের রচডেল নামক এক স্থানে ২৮ জন তাঁতিকে নিয়ে ২৮ পাউন্ড দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন— 'রচডেল ইক্যুইটেবল পাইওনিয়ার্স সোসাইটি'। প্রকৃতপক্ষে এটিই প্রথম সার্থক সমবায় সংগঠন। এর ঠিক চার বছর পর অর্থাৎ ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমজীবি মানুষের শোষণ মুক্তির পথ দেখাতে কমিউনিষ্ট ম্যনিফেস্টো প্রকাশ করেন। ফলে সমবায় ও সাম্যবাদ দুটি ব্যবস্থাপনাই মানুষের শোষণমুক্তির হাতিয়ার এবং সমাজতন্ত্রের সোপান হিসাবে পরিগণিত হল। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ১৯২টি দেশের ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের সাথে যুক্ত।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির পত্তন হয়। ১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদনে প্রেক্ষিতে 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ অ্যাক্ট অফ ১৯০৪' নামে এই আইনটি প্রণীত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমবায়কে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও উন্নয়নের প্রক্রিয়া বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও পরিষেবামূলক কাজে সমবায়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিল্প সমবায়ের উপর ভারতে প্রথম ওয়ার্কিং গ্রুপ (Working Group on Industrial Co-operative) গঠিত হয় ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই কমিটির উপর নিম্নলিখিত দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল :

১. গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে শিল্প সমবায় সমিতি গুলির অগ্রগতি সমীক্ষা করা।
২. শিল্প সমবায় সমিতিগুলির অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক ও বিপণন সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি পর্যালোচনা করা।
৩. শিল্প সমবায় সমিতিগুলির দ্রুত সংগঠনের পথে মূল অসুবিধাগুলি সমীক্ষা করা।

১৯৫৮ সালে এই ওয়ার্কিং গ্রুপ ভারত সরকারকে কিছু সুপারিশ দাখিল করে। নিম্নে নির্বাচিত কিছু সুপারিশ প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হল:[৮]

১. নির্দিষ্ট পেশার উপর ভিত্তি করে পৃথক পৃথক শিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হবে। সদস্যরা একই এলাকা, গ্রাম ও শহরের বাসিন্দা হবেন। যারা নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষতা অর্জন করেছেন ও নিজেরা হাতে কলমে কাজ করবে মূলত তাদেরই সদস্যভুক্ত করা যাবে।
২. শিল্প সমবায়গুলিকে কাঁচামাল সরবরাহের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজ্য স্তরে শীর্ষ তন্তুবায় সমবায় সংঘ প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি গুলিকে নিয়মিত ভাবে সুতো সরবরাহ করবে।
৩. গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে সুতোকল খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ, অনুদান, আমদানি লাইসেন্স প্রভৃতির মাধ্যমে রাজ্য সরকার গুলিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে।
৪. রাজ্য সরকার অধিক হারে শিল্প সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবে। সমস্ত সাহায্য স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই সরবরাহ করা হবে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে শিল্প সমবায় সমিতিসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকবে।
৫. সমবায় উদ্যোগে কি কি শিল্পদ্রব্য তৈরি হচ্ছে মাঝে মাঝে তার তালিকা প্রকাশ করে উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি বিক্রয়কেন্দ্রের সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্প সমবায়ের উৎপাদিত সামগ্রীকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬. ভারতীয় মানক সংস্থার (Indian Standard Institution) সাহায্যক্রমে বিভিন্ন শিল্প সমবায় কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ঠ মান প্রবর্তন করা একান্তই প্রয়োজন
৭. শিল্প সমবায় সমিতিগুলি যাতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ধরে রাখতে পারে, তার জন্য বিশেষ ধরনের অগ্রিম দাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. শিল্প সমবায়ের সাথে যুক্ত সরকারি ও বেসরকারি এবং বেতনভুক্ত ও অবৈতনিক কর্মীদের জন্যে শিল্প সমবায় বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. শিল্প ও সমবায় এই দুটি সরকারি দপ্তরের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ও যোগাযোগ রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। একটি বিভাগীয় সচিবের অধীনে এই দুটি দপ্তর থাকলে ভালো হয়।
১০. মহিলাদের মধ্যে শিল্প সমবায় কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যকে যদি জনপ্রিয় করা যায় তা হলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে, আর এই চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিতা মহিলা কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৪. লোকশিল্পে সমবায় সমিতির গ্রহণযোগ্যতা : লোকশিল্পীরা দেশের আর্থিক বুনিয়াদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতেও লোকশিল্পীদের ভূমিকা রয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে লোকশিল্প উৎপাদন বা সৃজনের হার ও বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। উৎপাদিত এইসব লোকশিল্প সম্ভার অনিয়ন্ত্রিত ও অসংঘটিত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাহিদা থাকলেও লোকশিল্পীরা সঠিক মূল্য পায় না, মধ্যবর্তী একশ্রেণির মানুষের জন্য। অর্থাৎ, দালাল শ্রেণির মানুষেরা লভ্যাংশের বেশির ভাগটাই গ্রাস করে। ফলে সেই প্রান্তিক লোকশিল্পীদের জীবনে আর্থিক উন্নতি ঘটে না। বিকল্প হিসাবে শিল্পীরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ উন্নতি সাধনের জন্য যৌথভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে সমবায় সমিতি গঠন করে। ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং লোকশিল্পীগোষ্ঠীর কাছে ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে সমবায় সমিতি শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বটে। দুর্বলতর শ্রেণির আর্থিক বিকাশে সমবায় যেমন ভূমিকা পালন করে চলেছে তেমনি তাদের বাঁচার নতুন আশা জুগিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই লোকশিল্পীদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। লোকশিল্পের বিভিন্নক্ষেত্রে তা লক্ষিত হয়। যেমন : তাঁতশিল্প, শঙ্খশিল্প, মৃৎশিল্প, ডোকরাশিল্প, শোলাশিল্প, পাথরশিল্প ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমানে রাঢ় অঞ্চলের বাঁকুড়া জেলায় মোট ৩৫টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে লোকশিল্পের উপর ভিত্তি করে গঠিত কয়েকটি সমবায় সমিতি হল : বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড (বিক্না), বাঁকুড়া শঙ্খশিল্প সমবায় সমিতি (বাঁকুড়া সদর), বেলমালা শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড (কুস্থলিয়া), পাঁচমুড়া মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড (পাঁচমুড়া) ইত্যাদি। অন্যদিকে আমাদের রাজ্যের অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় কোচবিহার জেলায় শীতল পাটির উপর একাধিক সমবায় কাজ করে তেমনি পশ্চিম মেদেনীপুরের সবং এ মাদুর কাঠির উপর সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। কাজেই লোকশিল্প ও লোকশিল্পীসমাজের সঙ্গে সমবায় সমিতির সম্পর্ক গভীরভাবে রয়রছে। সেই সম্পর্কের বিষয়টিকে নিম্নরূপ রেখাচিত্রের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে পারি:

লোকশিল্প ও সমবায় সমিতির

এই ধরনের লোকশিল্প গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমবায় সমিতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুসারে তন্তুবায় সমবায় সমিতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই আলোচনার সূত্রে একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে:

> *"রাজ্যে মোট ৭.১২ লক্ষ মানুষ হ্যাণ্ডলুম শিল্পে নিযুক্ত আছেন। রাজ্যে মোট লুমের সংখ্যা ৩,৮৮,৪৯৯ টি এবং এর মধ্যে সমবায় ক্ষেত্রে লুমের সংখ্যা ১,৫০,৯২৩ টি। পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রাথমিক তন্তুবায় সমিতি রয়েছে ২,০৮৭ টি, নিষ্ক্রিয় সমিতির সংখ্যা ১,০০৭ টি এবং অকেজো ও মৃতপ্রায় সমিতির সংখ্যা ২৮৩ টি।"*[৯]

লোকশিল্প সমবায় সমিতিতে সরকারি সাহায্যসমূহ :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকশিল্পীদের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে নিম্নে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

১. প্রয়োজন অনুসারে নামমাত্র সুদে মূলধনের সুবিধা।
২. তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা বাবদ অনুদানের সুবিধা।
৩. প্রতি বছর দুর্গা পূজার পর জেলা শিল্পকেন্দ্রের আয়োজিত জেলা ভিত্তিক লোকশিল্প তথা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতাসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।
৪. জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে আয়োজিত বিভিন্ন মেলা তথা প্রদর্শনীসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।
৫. বয়স্ক তথা দৈহিকভাবে অক্ষম শিল্পীদের জন্য সরকার প্রদত্ত বার্দ্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করা।
৬. শিল্পীদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান করা।
৭. লোকশিল্পীদের জীবনবীমার অধীনে আনা।

৫. সমবায় সমিতির সীমাবদ্ধতা : সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে লোকশিল্পীরা নানাভাবে উপকৃত হন। মূলধনের জোগান থেকে শুরু করে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদিত শিল্পসামগ্রীর বিপণন সহায়তা, প্রশিক্ষণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা শিল্পীরা অনায়াসেই পান। তবুও একথা বলা যায় লোকশিল্পীদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠনের ব্যপকতা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সমান ভাবে হয়নি। আবার অনেকক্ষেত্রে শিল্পীরা সমবায় গড়ে তুললেও নানা কারণে তা বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি— এই দু'রকম চিত্রই দেখা যায়। বেশ কিছু সমবায় দক্ষভাবে পরিচালনার সুবাদে ভালোভাবে চলছে আবার অন্যদিকে বেশ কিছু সমবায় অপেশাদারিত্বের কারণে অকেজো হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বাজার অর্থনীতির ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে লোকশিল্প বাঁচাতে ও লোকশিল্পীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, প্রয়োজন আরও বেশি করে সমবায় সমিতি গঠন এবং তার সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা। সমবায়ের সুফল সব শ্রেণির লোকশিল্পীদের মধ্যে প্রসারিত করা খুবই প্রয়োজন। কেননা শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কারণ শিল্পী বাঁচলে শিল্প বাঁচে এবং তার বিকাশ হয়। নিম্নে সমবায় সমিতির সীমাবদ্ধতার কারণগুলি পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল :

১. সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার পরে সেগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা, পর্যবেক্ষণের অভাবের সুযোগ নিয়ে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ সমিতি গুলির নামে অনুমোদিত অনুদান নিজেরাই গ্রাস করে।

২. সমিতি পরিচালনার জন্য Manager-দের উপযুক্ত সরকারী বেতনভুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদা দেওয়া হয় না এবং নির্দিষ্ট কোন বেতন কাঠামোও নেই। তাই Manager- রা সমিতি পরিচালনায় নিরুৎসাহী হয়ে পড়েন।

৩. কোন একটি শিল্প আঙ্গিকের জন্য যতটুকু অনুদান বা ঋণ প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক কম টাকা অনুমোদন করা হয়।

৪. সরকারী অনুদান বা ঋণ পাওয়ার জন্য জটিল নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নিয়মের জটিলতার কারণে লোকশিল্পীরা মূলধনের জন্য সরকার অপেক্ষা মহাজনের কাছে যেতেই বেশি পছন্দ করেন।

৫. সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা মেটানো যায় নি। খোলা বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে হয়, ফলে দাম মহাজনরা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. সমবায় সমিতির প্রসারে ও উন্নয়নের প্রধান প্রধান সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের কয়েকটি পথ :

সমবায় সমিতিগুলি নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে যে সমস্ত সমস্যার কথা সমবায় সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায়, সেগুলি হল :

১. অর্থনৈতিক সমস্যা (ঋণ/ অনুদান/কার্যকারি মূলধন), ২. সঠিক বিপণন ব্যবস্থার অভাব, ৩. প্রশিক্ষণের অভাব, ৪. পর্যাপ্ত স্থানের অভাব, ৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ৬. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ৭. পরিকল্পনার অভাব, ৮. অনিয়ন্ত্রিত বাজার, ৯. পারিশ্রমিক খুব কম, ১০. সরকারি উদাসীনতা, ১১. দক্ষ শিল্পীদের সংখ্যা খুব কম, ১২. কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, ১৩. প্রচারের অভাব, ১৪. উন্নত মানের যন্ত্রপাতির অভাব, ১৫. চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম, ১৬. মহাজনি অর্থে এই শিল্প চলে, ১৭. সরকারী নিয়মের জটিলতা, ১৮. স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ, ১৯. Co-operative Bank এর অসহযোগিতা, ২০. বিক্রয় হওয়া দ্রব্যের টাকা পেতে অনেক সময় লেগে যায়, ২১. শিল্পী বা কর্মীদের সদিচ্ছার অভাব, ২২. শিল্পীদের বার্দ্ধক্যকালীন পেনশ্নের ব্যবস্থা করা ।

লোকশিল্পীদের মতামত অনুসারে লোকশিল্প ও সমবায় সমিতির প্রসারে এবং উন্নয়নে যে সব পদক্ষেপ যথার্থভাবে গ্রহণ করা উচিৎ বলে মনে হয় সেগুলি হল :

১. অনুদানের ব্যবস্থা করা
২. কাঁচামালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা
৩. শিল্পীদের নুন্যতম বেতন কাঠামো তৈরি
৪. ভাতা প্রদান
৫. সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় মেলা এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা
৬. সরকারী বিপণন কেন্দ্র তৈরি করা ইত্যাদি।

৭. মূল্যায়ন : লোকশিল্পীরা সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতেও লোকশিল্পীরা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত লোকশিল্প আঙ্গিকগুলি অনিয়ন্ত্রিত ও অসংগঠিত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চাহিদা থাকলেও লোকশিল্পীরা সঠিক

মূল্য পায় না তার কারণ মধ্যবর্তী এক শ্রেণির মানুষ শিল্পীদের লভ্যাংশের বেশিরভাগটাই গ্রাস করে। ফলে সেই প্রান্তিক লোকশিল্পীদের জীবনে কোন আর্থিক উন্নতি ঘটে না। সমবায় সমিতি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শিল্পীদের ক্ষমতায়ন তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ঘটে। লোকশিল্পীদের কাছে সমবায় সমিতি শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বটে, যা তাদের জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. উপসংহার : পশ্চিমবঙ্গে লোকশিল্পী সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। পরিচালনার দক্ষতার উপর সমিতির সাফল্য নির্ভর করে। কোন কোন সমবায় সমিতি দক্ষভাবে পরিচালনার ফলে লোকশিল্পী সমাজে যেমন আশা জাগিয়েছে আবার পর্যবেক্ষণের অভাবে তা ভেঙেও গেছে। লোকশিল্পীদের ক্ষমতায়নে এই সমবায় সমিতিগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তেমনি কখনো কখনো ব্যর্থতার কারণে নিরুৎসাহিত হয়ে হতাশায় ডুবে যায়। সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমেই ভবিষ্যতে প্রান্তিক লোকশিল্পীদের কাছে তা প্রধান সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র :

১. মণ্ডল, সুজয় কুমার, লোকশিল্পঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, নটনম্‌কোলকাতা, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ২১।

২. তথ্যসূত্র নং ২ পৃ. ৩০-৩১।

৩. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাঃ) লোকজশিল্প, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯২৮), সমবায় নীতি, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমগ্র, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

৫. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৪।

৬. উদ্ধৃত: Zeuli Kimberly A., Robert Croop, 'Co-operatives principles and practices in the 21st century'. U.K Extension, 1980, P.1.

৭. Website of West Bengal Government Co-operative Department.

৮. রায়, অসীম, সমবায় বিষয়ক বিবিধ কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, ২০০৫, পৃ. ৩০-৩১।

৯. চ্যাটার্জী, স্বপন, বাংলার তাঁত, তন্তুজাত পণ্য ও বস্ত্রশিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ভান্ডার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, কলকাতা, ১৫মে ২০০৯, পৃ.৩০।

তথ্যদাতা :

১. দাস সুকুমার (৫১), তাঁতশিল্পী, জয়পুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা, বাঁকুড়া, ২২.০৬.২০১৩

২. সরকার তরনি (৪০), মাদুরশিল্পী, হরিণঘাটা, নদীয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০৮.০৭.২০১৩

৩. মুখার্জী বৈদ্যনাথ (৬৫), প্রশাসক, আমার কুঠীর, বীরভূম, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৮.০৩.২০১৪

৪. আনন্দ কুমার দাস (৮০), বাঁশ ও বেত শিল্পী, কাশিপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২২.০৭.২০১৪

৫. মাহাতো জয়দেব (৫২), লাক্ষাশিল্পী, ঝালদা, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০৬.০৯.২০১৪

৬. চঁন্দ সমীর (৪৩), কাঁসা পিতলশিল্পী, কেঞ্জাকুরা, বাঁকুরা, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০৮.০৯.২০১৪

৭. কার্জি শষ্যবতী (৪৮), তাঁতশিল্পী, কামাক্ষাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ক্ষেত্রসমীক্ষা

গ্রন্থপঞ্জি :

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার, ১৩৬৮ (বঙ্গাব্দ), বাংলার লোকশিল্প, কলকাতা।

ঘোষ, দীপঙ্কর, ২০০২, পশ্চিমবঙ্গ মৃৎশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।

ঘোষ, দীপঙ্কর, ও ভট্টাচার্য, মিহির, (সম্পাঃ), ২০০৪, বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।

ঘোষ, প্রদ্যোৎ, ২০০৪, বাংলার লোকশিল্প, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাঃ), ২০১১, লোকজশিল্প, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাঃ), ১৯৯৫, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।

চক্রবর্তী, বিমলেন্দু (বঙ্গাব্দ), ১৪০৩, লোকায়ত বাংলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা।

চক্রবর্তী, রাধাগোপাল, ২০০৪, ব্রিটিশ আমল ও বাংলার সমবায়, ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবার্ণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস অ্যাণ্ড ক্রেডিট সোসাইটিস লিমিটেড।

চট্টোপাধ্যায়, তুষার, ১৯৮৫, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, দেবদাস, ১৯৯৪, রাঢ়বঙ্গের উৎসর্গশিল্প, একাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা।

চৌধুরী, দুলাল (সম্পাঃ), ২০০৪, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, একাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা।

জানা, অচিন্ত্য, ১৯৯৪, বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে লোকশিল্প (প্রথম খণ্ড), রাঢ় একাদেমি, বাঁকুড়া।

জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, মেদিনীপুর, ২০০২, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৮, সমবায় নীতি, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমগ্র, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

মণ্ডল, সুজয়কুমার, ২০১১, লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, নটনম্‌কোলকাতা, কলকাতা।

রায়, অসীম, ২০০৫, সমবায় বিষয়ক বিবিধ কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন।

Bedi, R.D, 1992, Theory History and Practice of Co-operative, R. Lall Book Depot, Mecrut (U.P)

Bhattacjariya, Asutosh, 1974, Folklore of Bengal, National Book Trust, India, New Dellhi.

Jha, D, 1998, In Search of Co-operative Values, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. Bangalore.

Mathur, B.S. 1971, Co-operation in India, Sahitya Bhawan, Agra.

Dubhashi, P.R, Principles and Philosophy of Co-operation National Institute of Co-operative Management, Poona.

পত্র-পত্রিকা :

ভাণ্ডার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, কলকাতা, ১৫ মে, ২০০৯।

ভাণ্ডার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, ২০০৯।

মুখোপাধযায়, আশুতোষ, ‘সমবায় বিষয়ক ভাবনা, ভাণ্ডার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, ২০০৯।

চক্রবর্তী, রাধাগোপাল, প্রাচীন ভারতের সমবায়ের সন্ধানে, ভাণ্ডার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, ২০০৯।

চ্যাটার্জী, স্বপন, বাংলার তাঁত, তন্তুজাত পণ্য ও বস্ত্রশিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ভাণ্ডার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, কলকাতা, ১৫মে ২০০৯

Zeuli, KimberlyA, Robert Cropp, ‘Co-operative Principles and Practices in the 21st Century’, UK Extension, 1980.